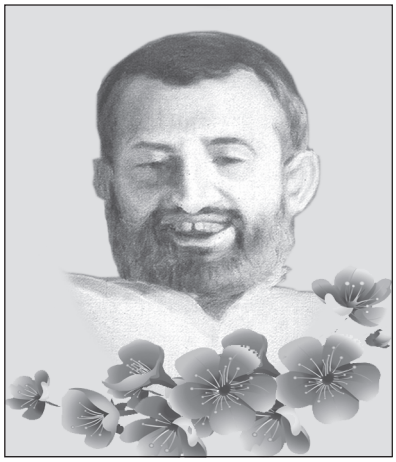

# প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা

'অবতারবরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব শুধুমাত্র ভারতেই নয়, বিশ্বের অধ্যাত্ম-ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। তিনি এসেছিলেন মানুষকে যথার্থ 'মানহুঁশ' করে, তাদের দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তাঁর জীবনীপাঠে আমরা অবগত হই, সুদীর্ঘ বারো বছরের অধ্যাত্মসাধনার অবসানে তিনি ভক্তসঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। মা ভবতারিণীর মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় চারিদিক যখন কাঁসর- ঘণ্টার ধ্বনিতে মুখরিত, তখন কুঠিবাড়ির ছাদে উঠে উচ্চকণ্ঠে সকাতরে আহ্বান করতেন : '' তোরা সব কে কোথায় আছিস, আয় রে—তোদের না দেখে আর থাকতে পারচি না।" এই প্রাণমাতানো ডাক পরবর্তী কালে কত শত অধ্যাত্মপিপাসু মানুষকে তাঁর কাছে নিয়ে এসেছিল। তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ষোলোজন ত্যাগী পার্ষদ যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন রামচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মাস্টারমশাই প্রমুখ গৃহস্থভক্ত।

একদিন দক্ষিণেশ্বর থেকে বরানগরে হেঁটে ফেরার সময় নরেন্দ্রনাথ হরিনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলতে বললেন। হরিনাথ বললেন, সেই মহান পুরুষকে কীভাবেই বা তিনি বর্ণনা করতে পারেন! এই বলে তিনি শিবমহিম্নঃস্তোত্র থেকে উদ্ধৃত করলেন : ''অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে/ সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী..." ইত্যাদি। অর্থাৎ নীল পর্বত যদি কালি হয়, সাগর যদি মসিপাত্র হয়, লেখনী যদি পারিজাত বৃক্ষের শ্রেষ্ঠ শাখা হয়, পৃথিবী যদি লেখার পত্র হয় আর এইসব নিয়ে সরস্বতী যদি চিরকাল ধরে লিখতে থাকেন, তথাপি হে ঈশ্বর, তোমার গুণাবলির ইয়ত্তা হতে পারে না।

তারপর হরিনাথ যখন এ-প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন তখন নরেন্দ্রনাথ বলেন, ''ওঁর কথা আর কি বলব? আমাকে যদি বল, তিনি এল-ও-ভি-ই (Love) personified (মূর্তিমান প্রেম)।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামীজী ও তুরীয়ানন্দজী মহারাজের দুটি মন্তব্যই সত্য। কারণ আপাতদৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন এক অতি সাধারণ দরিদ্র পূজারি ব্রাহ্মণ, একেবারে অনাড়ম্বর, তাঁর না ছিল কোনও বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা, বংশগৌরব বা আভিজাত্য। অথচ তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ মহাপুরুষ। পরবর্তী কালে একবার গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বামীজীকে অনুরোধ করেছিলেন ঠাকুরের একটি জীবনী

লিখতে। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উত্তেজিতভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, ''দেখুন, গিরিশবাবু আমাকে ঐ অনুরোধটি করবেন না।... তিনি এত মহান্ ছিলেন, এত বড় ছিলেন যে, আমি তাঁকে কিছুই বুঝতে পারিনি। তাঁর জীবনের এক কণাও আমি জানতে পারিনি। শেষে শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়ে ফেলব? আমি তা পারব না।" অথচ তিনিই মন্তব্য করেছিলেন যে ঠাকুর ভালবাসার মূর্ত বিগ্রহ। তাঁর এই দুই উক্তিই সমভাবে সত্য। কারণ ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন অহেতুকী কৃপা এবং অতুলনীয় করুণার জন্যই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসেবে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

''পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

—সাধুদের রক্ষা, দুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

কিন্তু তাঁর এই কাজগুলি তিনি নিজধাম থেকেই করতে পারতেন। তিনি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি রক্ষার জন্য, দোষ-ত্রুটি নির্মূল করে তাকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য তাঁর ধরাধামে নেমে আসার কোনও প্রয়োজন নেই। তাহলে ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবানের রক্তমাংসের শরীরধারণ করে মর্ত্যের ধূলিতে অবতীর্ণ হওয়ার কী প্রয়োজন? তাঁর অবতরণের একমাত্র কারণই হল মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসা। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। তার কোনওরকম অধঃপতন বা লক্ষ্যভ্রষ্টতা তিনি সহ্য করতে পারেন না। সেজন্যই মানুষকে আদর্শচ্যুত হতে দেখলে তিনি মানবরূপে অবতরণ করেন এবং মানবশরীরের রোগশোক, দুঃখবেদনা, জ্বালাযন্ত্রণা, আঘাত-অপমান—সবই সহ্য করেন। এর মূলে রয়েছে মানুষের প্রতি তাঁর অপার্থিব ভালবাসা। তিনি নিজমুখে গীতায় স্বীকার করেছেন : ''পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।" তিনি শুধু পিতা বা মাতা নন, তিনি পিতামহও। তাঁর সন্তানেরা স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হলে তিনি সেটি সহ্য করতে পারেন না। তাই তাদেরকে লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিত করতে তাঁর আবির্ভাব। তিনি আসেন করুণায় বিগলিত হয়ে।

ভগবানের ভালবাসা অহেতুক, পাবনী। আর এই প্রেমের প্রকাশ অবতারের ভেতরেই বেশি দেখা যায়। এজন্যই তিনি সমস্ত কষ্ট সহ্য করেও অবতাররূপে আসেন মানুষের মাঝে মানুষের সাজে। এই অবতারতত্ত্ব বোঝা অতি দুষ্কর। অবতারের মধ্যে দেবত্ব ও মানবত্বের অপূর্ব সম্মিলন দেখা যায়। অবতার হলেন দেবমানব। তিনি স্বরূপত নিরঞ্জন ও নির্গুণ, অথচ গুণময় ও নররূপধারী।

কথামৃতে আমরা যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই অভূতপূর্ব ভালবাসার শত শত দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। তাঁর ভালবাসা শুধু যে শুদ্ধ পবিত্রাত্মা কামকাঞ্চনত্যাগী ভক্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম প্রেম। তাঁর এই ভালবাসার অতুলনীয় প্রকাশ আমরা দেখি সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ, অধঃপতিতদের প্রতিও। মন্দিরের পাচক ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে দুশ্চরিত্র, মদ্যপ, গুন্ডা, থিয়েটারের নটনটী—কেউই তাঁর অপার করুণা ও অপার্থিব প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়নি। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি।

মথুরবাবুর বাড়ির দাসী ভগবতী। বহু বছর সে মথুরবাবুর বাড়িতে কাজ করে। প্রথম বয়সে তার স্বভাব ভাল ছিল না; কিন্তু পরে পরিবর্তন হয়। সদ্য তীর্থভ্রমণ করে একদিন সন্ধ্যার পর সে ঠাকুরের কাছে এসেছে। ঠাকুর দয়ার সাগর, তার সঙ্গে অনেক পুরনো দিনের কথা বলছেন। তার কাশী-বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থভ্রমণের কথা, দানধ্যান, সাধুসেবার কথা তাকে আন্তরিকতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা

করছেন। ফিরে যাওয়ার সময় হঠাৎই ভগবতী সাহস পেয়ে ঠাকুরকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। প্রত্যক্ষদর্শী মাস্টারমশাইয়ের বর্ণনায়—বৃশ্চিক দংশন করলে যেমন মানুষ চমকে ওঠে ও অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি অস্থির হয়ে 'গোবিন্দ' গোবিন্দ' বলতে বলতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘরের কোণে গঙ্গাজলের জালা ছিল—হাঁপাতে হাঁপাতে যেন ত্রস্ত হয়ে সেই জালার কাছে গেলেন। পায়ের যে-অংশে দাসী স্পর্শ করেছিল গঙ্গাজল নিয়ে সেই স্থান বারে বারে ধুতে লাগলেন। উপস্থিত ভক্তেরা বিস্মিত, স্তম্ভিত। ভগবতী যেন জীবন্মৃতা হয়ে বসে আছে। ঠাকুরের দৃষ্টি যখন তার উপর পড়ল, তিনি তার মনের কষ্ট বুঝতে পারলেন। ঠাকুরের চোখে নারীমাত্রেই জগদম্বার প্রতিমূর্তি। কিন্তু তিনি যেহেতু প্রস্তুত ছিলেন না, ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি এমন আচরণ করেছিলেন। এর আগে যখন গিরিশবাবুর অনুরোধে থিয়েটারের সব নটনটী তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন, তিনি হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে সবার প্রণাম গ্রহণ করে অত্যন্ত করুণামাখা স্বরে বলেছিলেন 'থাক মা, থাক মা'। কিন্তু এক্ষেত্রে ঠাকুরের সেই মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। পরে ভগবতীর মনঃকষ্ট দেখে তিনি নিজের আচরণে খুবই অনুতপ্ত হলেন। দয়াসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ তখন দাসীকে সম্বোধন করে সকরুণ মিষ্টস্বরে বললেন, ''তোরা অমনি প্রণাম করবি।'' এই বলে আসন গ্রহণ করে তাকে ভোলাবার জন্য বললেন, ''একটু গান শোন।'' তারপর তিনি প্রাণমাতানো কণ্ঠে ভাবে মাতোয়ারা হয়ে পরপর তিনটি মাতৃসংগীত গাইলেন।

এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবতীর সমস্ত দুঃখ আকর্ষণ করে নিয়ে তার মন আনন্দে ভরিয়ে দিলেন শুধু নয়, তাকে সকলের তিরস্কারের হাত থেকেও রক্ষা করলেন।

আর একটি ঘটনা। কাশীশ্বর মিত্র ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্মভক্ত। নন্দনবাগানে নিজের বাড়িতে তিনি মাঝে মাঝে ভক্তদের নিমন্ত্রণ করে উৎসব করতেন। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর পুত্রেরা সেই উৎসবের আয়োজন করতেন। একবার তাঁরা ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। ঠাকুর সানন্দে উৎসবপ্রাঙ্গণে ভক্তসঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা, উপাসনা, সংগীত ইত্যাদি একে একে সমাপ্ত হয়েছে। ভক্তদের লুচি, মিষ্টান্নাদি খাওয়াবার উদ্যোগ হচ্ছে। রাত নটা হল, এবার ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে ফিরতে হবে। গৃহস্বামীরা উপস্থিত নিমন্ত্রিত ভক্তদের নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন যে, ঠাকুরের সংবাদ নেওয়ার কথা তাঁদের মনে নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন সঙ্গী রাখাল প্রভৃতিকে বলছেন, ''কিরে কেউ ডাকে না যে রে!''

রাখাল ছিলেন সম্ভ্রান্ত জমিদারবংশের ছেলে। তিনি অমন পরিস্থিতিতে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে ঠাকুরকে সক্রোধে বলেন, ''মহাশয়, চলে আসুন—দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাই।'' শ্রীরামকৃষ্ণ তখন সহাস্যে বলেন—''আরে রোস্—গাড়িভাড়া তিন টাকা দুআনা কে দেবে!—রোখ করলেই হয় না। পয়সা নাই আবার ফাঁকা রোখ! আর এত রাত্রে খাই কোথা!'' অনেকক্ষণ পর শোনা গেল পাতা হয়েছে। সব ভক্তদের একসঙ্গে আহ্বান করা হল। ঠাকুর সঙ্গীদের নিয়ে দোতলায় জলযোগ করতে গেলেন। ভিড়ের মধ্যে বসার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক কষ্টে ঠাকুরকে একধারে বসানো হল। স্থানটি অপরিষ্কার। একজন রাঁধুনি ব্রাহ্মণী তরকারি পরিবেশন করল। ঠাকুরের তরকারি খেতে প্রবৃত্তি হল না। তিনি কোনওরকমে নুন টাকনা দিয়ে একটি লুচি ও কিছু মিষ্টান্ন গ্রহণ করলেন। তাঁর মনোভাব, গৃহস্বামীরা তো জানে না যে স্বয়ং ভগবান এসেছেন, আর তারা ভগবানকে উদ্দেশ করেই তো এই সমস্ত আয়োজন করেছে! তাদের অল্পবয়স,

তারা তাঁর পূজা করতে জানে না বলে তিনি কেন বিরক্ত হবেন? তিনি না খেয়ে চলে গেলে যে তাদের অমঙ্গল! এরপর জলযোগ সমাপ্ত হলে ঠাকুর গাড়িতে উঠলেন। কিন্তু গাড়িভাড়া কে দেবে? গৃহস্বামীদের দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। ঠাকুর পরে স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক মিশিয়ে গল্প করেছিলেন : ''(আমার সঙ্গীরা) গাড়িভাড়া চাইতে গেল। তা প্রথমে হাঁকিয়ে দিলে!—তারপর অনেক কষ্টে তিন টাকা পাওয়া গেল, দুআনা আর দিলে না! বলে, ওইতেই হবে।'' ভক্তদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের যে কী অপার করুণা, অহেতুক ভালবাসা, অসীম ক্ষমা—এ-ঘটনা তারই পরিচায়ক।

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে মনোমোহন মিত্রের নাম করলে অত্যুক্তি হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তদের অন্যতম মনোমোহন। প্রথমজীবনে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন। রামচন্দ্র দত্তের সঙ্গে তিনি সর্বপ্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং ঠাকুরকে দর্শন করেন। ঠাকুরের কৃপায় তাঁর জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাঁকে গুরুরূপে গ্রহণের পর তাঁর অন্তরে আমূল পরিবর্তন আসে। ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের পর সাধনভজনের দিকে মনোমোহনের ঝোঁক বাড়তে থাকে এবং মন ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে।

আদরের দুলাল মনোমোহন ছিলেন পিতার একমাত্র সন্তান এবং বড় অভিমানী। অন্য কারও প্রশংসা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একবার ঠাকুর তাঁর সামনে সুরেন্দ্রের ভক্তির প্রশংসা করলে তিনি অন্তরে অভিমানে ফুলে উঠলেন। তিনি প্রতি শনিবার দক্ষিণেশ্বরে যেতেন, কিন্তু পরপর কয়েক সপ্তাহ আর গেলেন না। ঠাকুর খবর পাঠালে তিনি উত্তর দিলেন, ''তিনি তাঁর ভক্ত নিয়ে সুখে থাকুন, আমি সেখানকার কে?'' পরে ঠাকুর আবার রাখালকে পাঠালেন মনমোহনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু মনমোহন নিজে তো এলেনই না, রাখালকেও আসতে দিলেন না। তবে অভিমানবশত বিপরীত আচরণ করলেও তাঁর মন সর্বদা দক্ষিণেশ্বরেই পড়ে থাকত। সর্বক্ষণ তিনি ঠাকুরের কথাই চিন্তা করতেন—অন্য কোনও বিষয়ে মনস্থির করতে পারতেন না। ঠাকুরের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভে বঞ্চিত হয়ে অন্তরে খুবই কষ্ট অনুভব করছিলেন। বাহ্যিক এই বিচ্ছেদ ক্রমশই যেন তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠছিল।

এইরকম যখন মনের অবস্থা, তখন একদিন গঙ্গাস্নানের সময় হঠাৎ তিনি দেখলেন একটা নৌকা তাঁর খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছে। এতে তিনি একটু বিরক্ত হয়ে যেই সেইদিকে তাকিয়েছেন, দেখেন নৌকায় ভক্ত বলরামবাবু। তাঁকে দেখতে পেয়ে মনোমোহন বলে উঠলেন : ''আজ প্রাতেই ভক্তদর্শন হল—আজ আমার মহাসৌভাগ্য দেখছি।'' বলরাম উত্তর দিলেন : ''শুধু ভক্ত নয়, প্রভু খোদ এসেছেন।'' 'প্রভু' কথাটি শোনামাত্র মনোমোহন চমকে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জনের গলা শুনতে পেলেন, ''আপনি দক্ষিণেশ্বরে যান না কেন? আপনাকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ঠাকুর স্বয়ং এখানে এসেছেন।'' মনোমোহন দেখলেন ঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে, সমাধিস্থ। তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে। এ-দৃশ্য দেখে পাষাণও বিগলিত হয়ে যায়। মনোমোহনের অভিমান কোথায় মিলিয়ে গেল। নিজের অন্যায় অভিমান, অত্যাচারের কথা ভেবে তিনি অচেতন হয়ে জলে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন। তৎক্ষণাৎ নিরঞ্জন তাঁকে তুলে ধরলেন। তখন তিনি নৌকায় উঠে এসে ঠাকুরের চরণতলে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সেদিন ঠাকুর তাঁর বাড়িতে গিয়ে কিছু সময় কাটিয়ে তাঁকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরলেন।

মনোমোহনের ছিল ঠাকুরের প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও ভালবাসা। ছিল তাঁর কাছে ছুটে যাওয়ার ব্যাকুলতা কিন্তু প্রতিবন্ধক ছিল তাঁর অভিমান। তাই

অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুর স্বয়ং এসে সেই অভিমানের রুদ্ধ দুয়ার খুলে স্বয়ং তাঁর হৃদয়সিংহাসনে চিরদিনের মতো আসন গ্রহণ করলেন। শেষদিন পর্যন্ত মনোমোহন ছিলেন তাঁর ঐকান্তিক একনিষ্ঠ ভক্ত। ঠাকুরের মহাসমাধির পর জনসমক্ষে তাঁর মহিমা প্রচারে তিনি ছিলেন অগ্রণী।

আরও একটি দৃষ্টান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত অধর সেনের বন্ধু সারদাচরণ ছিলেন স্কুলের ডেপুটি ইন্সপেক্টর। তাঁর পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সী বড় ছেলে সামান্য অসুখে মারা যাওয়াতে তিনি শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন। শ্মশান থেকেই অধর সেন তাঁকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হলেন। সব শুনে ঠাকুর গান ধরলেন : ''জীব সাজো সমরে,/ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।''

গান শুনতে শুনতে সারদাচরণ অনেকটা স্বাভাবিক হলেন। গান সমাপ্ত করে ঠাকুর বললেন, ''তা শোক হবে না গা? আত্মজ!'' তারপর ঠাকুর একটি গল্প বললেন। রাবণ বধের পর লক্ষ্মণ তাঁর কাছে গিয়ে দেখেন, হাড়ের ভিতর এমন জায়গা নেই যেখানে ছিদ্র নেই। মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্মণ বললেন, ''রাম! তোমার বাণের কি মহিমা!'' তখন রাম বললেন, ''ভাই, হাড়ের ভিতর যে-সব ছিদ্র দেখছ, ও বাণের জন্য নয়। শোকে তার হাড় জরজর হয়েছে।''

ঠাকুর আরও বললেন, ''কি করবে? এই কালের জন্য প্রস্তুত হও। কাল ঘরে প্রবেশ করেছে, তাঁর নামরূপ অস্ত্র লয়ে যুদ্ধ করতে হবে, তিনিই কর্তা। আমি বলি, যেমন করাও, তেমনি করি; যেমন বলাও তেমনি বলি; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি গাড়ি, তুমি ইঞ্জিনিয়ার।

''তাঁকে আম্‌মোক্তারি দাও! ভাল লোকের উপর ভার দিলে অমঙ্গল হয় না। তিনি যা হয় করুন।'' সারদাচরণের দুঃখে তিনি এমন বিগলিত হয়ে গেলেন যে মনে হল তাঁরই পুত্রশোক হয়েছে।

তারপর ঠাকুর বলতে আরম্ভ করলেন, ''তবে এ-সব অনিত্য। গৃহ, পরিবার, সন্তান দুদিনের জন্য। তালগাছই সত্য। দু-একটা তাল খসে পড়েছে। তার আর দুঃখ কি?'' এভাবে ঠাকুর তাঁর দুঃখ লাঘব করে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষের দুঃখ দেখে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন।

বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনকাহিনি সর্বজনবিদিত। কিন্তু এর থেকে বড় পরিচয়, রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ভক্তির পরাকাষ্ঠা। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর এত গভীর বিশ্বাস ছিল যে ঠাকুর নিজেই বলতেন, গিরিশের 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস।' শ্রীশ্রীঠাকুরের অহেতুকী কৃপার অপূর্ব নিদর্শন ছিল তাঁর জীবন। গিরিশ নিজমুখে বলতেন, তিনি যেখানে বসতেন সেই জায়গার সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়ে যেত; তিনি করেননি এমন কোনও পাপ নেই। তবু পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুক কৃপার বলে তিনি শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগব্রতী সাধুদের সঙ্গে একাসনে বসবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যাঁকে 'প্রেমপাথার' বলে বর্ণনা করেছেন, তাঁর প্রেমের দিকটি এত মহান ও বিরাট যে স্বল্পপরিসরে তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অসম্ভব। তবু বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের মতো কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে সেই প্রয়াস করা গেল। ✠

## সডাক গ্রাহকদের প্রতি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পূজাসংখ্যা ও বিশেষ সংখ্যা রেজিস্ট্রি ডাকে পেতে হলে প্রতিক্ষেত্রে অতিরিক্ত ২৫ টাকা দিতে হবে।